প্রথম আলো

তারিখ ... JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা গবেষণা ■ মোহাম্মদ কায়কোবাদ

# বাংলাদেশে গবেষণার বিরল সাফল্য

শিক্ষা খাতে আমাদের বিনিয়োগ যে যথাযথ নয়, তা সর্বজন সুবিদিত। বর্তমান সরকারের অধীনে বড় নামের শিক্ষা কমিশন নয়, একটি শিক্ষা কমিটি দ্রুত একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে, যা চূড়ান্ত করার আগে সবার অবগতি ও প্রয়োজনীয় সুপারিশের জন্য ওয়েবে আপলোডও করা হয়েছিল। সরকারের আয়ুষ্কাল থাকতেই এর বাস্তবায়নে দ্রুত হাত দেওয়া প্রয়োজন ছিল। তা হয়নি। তবে সুখের বিষয় এই যে ১৪-১৫ বছর ধরে গবেষণার জন্য সরকারের নানা অঙ্গপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্থায়ন হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত নামে) ১৪-১৫ বছর ধরে প্রতিবছর প্রায় ১২ কোটি টাকার মতো বরাদ্দ দিচ্ছে গবেষণার জন্য। এর সঙ্গে কয়েক বছর আগে যোগ হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও কিছু অর্থ বরাদ্দ দিয়ে গবেষণাকাজকে উৎসাহিত করে থাকে। বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি ইউএসডিএ ফান্ডের সুদাংশ থেকে কৃষিভিত্তিক গবেষণাকে উৎসাহিত করার জন্য অর্থায়ন করছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন HEQEP প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মানকে উন্নত করার চেষ্টা করছে। propro প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সদ্য প্রয়াত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম বলতেন, 'খুব কম অর্থ খারাপ আর বেশি অর্থ আরও খারাপ।'

উন্নত দেশসমূহে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গবেষণায় অর্থায়ন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের উদার অর্থায়নের কথা কে না জানে। একইভাবে কানাডায় রয়েছে ন্যাচারাল সায়েন্সেস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ এবং মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল অব কানাডা। এর ফলও পরিষ্কার। সারা পৃথিবীর গবেষণাপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মানক্রম করলে প্রথম ২০-এ হয়তো অন্য কোনো দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের নামই আসবে না। প্রথম ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৪টিই যুক্তরাষ্ট্রে আর বাদবাকিগুলো বিভিন্ন উন্নত দেশে। মাত্র ৫ শতাংশ মানুষের দেশ যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহভাগ, অগ্রগতির মাপকাঠিতেও তারা, সিংহভাগ নোবেল পুরস্কারও তারাই পাচ্ছে, গোটা পৃথিবীতে খবরদারিও করে বেড়াচ্ছে। শিক্ষা ও গবেষণায় বিনিয়োগ করলে তার রিটার্ন যে কত বেশি হতে পারে, তা কোরিয়ার অগ্রগতি দেখেও অনুমান করা যায়। ৫০ বছর আগে উন্নতির মাপকাঠিতে তারা ঠিক আমাদের মতো ছিল। মার্কিন বরাদ্দের মাপকাঠিতে আমাদের বিনিয়োগ ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

১২-১৪ বছর ধরে আমাদের দেশে গবেষণার জন্য যে তহবিলের জোগান দেওয়া হচ্ছে, তার থেকে আমরা উন্নত মানের জার্নালে কতগুলো গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি, তার হিসাব আছে বলে জানি না। পরিসংখ্যানের তত্ত্ব মেনে নিলে অর্থায়িত গবেষণাসমূহের ফলাফল মোটেও সন্তোষজনক নয়, যদি গবেষকেরা ভুল করে কিংবা ইচ্ছা করে প্রতিষ্ঠানকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না থাকেন। এসব প্রকল্প সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে অনেক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে, ল্যাবরেটরি তৈরি হয়েছে, এখন যে কেউ গবেষণা করতে পারবেন। যিনি কাজের জন্য যন্ত্রের অভাব অনুভব করেছিলেন, তিনি যদি যন্ত্র ক্রয়ের পর তা ব্যবহার করে নিজে কোনো গবেষণা না করেন, তাহলে অন্য আরেকজন করবেন, তা বিশ্বাস করা কঠিন। অন্য আরেকজন ক্রয় করার জন্য আরেকটি প্রকল্প জমা দেবেন, অনুমোদিত হলে আবার ক্রয় করবেন। বছর আট-নয় আগে আমার এমন কিছু প্রকল্প পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছিল। কোটি টাকার মূল্যবান যন্ত্র ক্রয় করে তা আর চালানো যায়নি, সত্যটা সম্ভবত এর কাছাকাছি ছিল।

এই অন্ধকারেও রুপালি আলোর রেখা রয়েছে। আমাদের বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ সাইদুর রহমান বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০০৯-১০ অর্থবছরে 'ফ্যাসিলিটি আপগ্রেডেশন ফর সাসটেইনেবল রিসার্চ অন গ্রাফ ড্রয়িং অ্যান্ড ইনফরমেশন ভিজুয়ালাইজেশন' শিরোনামের আট লাখ ৮০ হাজার টাকার এক বছরের একটি প্রকল্প পেয়েছিলেন। প্রকল্পের অর্থ ছাড় হয়েছে ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি ও জুন মাসে। ২০১১ সালের ১৬ জানুয়ারি তিনি চূড়ান্ত প্রতিবেদনও জমা দিয়েছেন। তিনি শুধু সুযোগ তৈরিই করেননি, তাকে ব্যবহার করেও দেখিয়েছেন। ওই অর্থায়নে তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগে গ্রাফ ড্রয়িং অ্যান্ড ইনফরমেশন ভিজুয়ালাইজেশন নামের একটি ল্যাবরেটরি তৈরি করেছেন।

২০১০ সাল থেকে তাঁর এই প্রকল্পের অধীনে তিনি প্রায় ১৫টি পেপার প্রকাশ করেছেন, যার সব শুধু বিদেশে নয়, যথেষ্ট ভালো প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত। জার্নাল অব কম্বিন্যাটরিয়াল অপটিমাইজেশন, গ্রাফ ড্রয়িং, ডিসক্রিট ম্যাথমেটিকস অ্যালগরিদমস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন্স, কম্পিউটেশনাল জিওমেট্রি, ওয়ার্কশপ অন অ্যালগরিদমস অ্যান্ড কম্পিউটেশন, ইন্টারন্যাশনাল কম্পিউটিং অ্যান্ড কম্বিন্যাটরিক্স কনফারেন্স। বাংলাদেশ সরকার যে গবেষণা করার জন্য অর্থায়ন করে থাকে, অধ্যাপক সাইদুর রহমানের পেপারগুলো তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তিনি প্রকল্পটি খুব বেশি দিন আগে পাননি কিন্তু এরই মধ্যে এত গবেষণা ফলাফল প্রকাশ। আট লাখ ৮০ হাজার টাকার প্রকল্প থেকে ১৫টি পেপার! আমরা যে আরও শত শত গবেষককে টাকা দিলাম, তাঁরা আমাদের কী দিলেন? আমার মনে হয়, প্রতিটি ফান্ডিং কর্তৃপক্ষকে এগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। যেসব গবেষকের প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়েছে, তাঁরা কি আর্থিক কিংবা প্রাযুক্তিক ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রসরতায় অবদান রাখতে পেরেছেন, তাঁরা কি আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ করতে পেরেছেন?

মনে রাখতে হবে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল নিয়ে জাতীয় দৈনিকে কিংবা সাপ্তাহিকে শত শত নিবন্ধ প্রকাশিত হলেও তার বৈজ্ঞানিক মান এতটুকুও বাড়বে না, যদি তা আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে কিংবা কনফারেন্সে প্রকাশিত না হয়। গবেষণা প্রকল্পসমূহের এ পর্যন্ত অর্থায়ন নিয়ে বিশ্লেষণ হওয়া দরকার, যাতে ভবিষ্যতে আমাদের অর্থায়নের ফলাফল অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়। ১৪-১৫ বছর ধরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে, এর ফলে গবেষণায় আমরা বিন্দুমাত্র যে অগ্রসর হয়েছি, তার প্রমাণ অন্তত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উন্নততর মানক্রমের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনোভাবে প্রমাণিত হয়নি।

সুখের বিষয়, পাটের জিনোমে সিকুয়েন্সিংয়ের আমাদের তরুণ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের বিষয়টি জাতীয় সংসদেও উচ্চারিত হয়েছে, প্রশংসিত হয়েছে। আমাদের সরকার সেই কাজে প্রায় ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দও দিয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে পত্রপত্রিকায়ও ফলাও করে লেখা হয়েছে। এখন সংশ্লিষ্ট কাজগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হলো কি না, উচ্চারিত আশাবাদ অনুযায়ী উন্নত মানের পাট আবিষ্কারের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতিতে তা অবদান রাখবে কি না, তা আমার জানা নেই। http://www.jutegenome.org শিরোনামের ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে মাত্র একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বলে উদ্ধৃত হয়েছে। তবে পাটের জন্মরহস্য আবিষ্কার প্রকল্পের মূল গবেষক অধ্যাপক মাকসুদুল আলমের বেশ কয়েকটি পেপার বিএমসি বায়োইনফরমেটিকস নামের ৪.০৭ ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ২০১২ সালের ১৩তম সংখ্যায় ১৫ জন বিজ্ঞানীর লেখা এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য আমাদের ছাত্র রেজাউল আলম চৌধুরী ও অস্টিনের ডক্টরাল ছাত্র মুহিবুর রশিদ তাদের সুপারভাইজরের সঙ্গে ৫.৪৬৮ ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরের বায়োইনফরমেটিকস জার্নালের ২৭তম ভলিউমে তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল ২০১১ সালে প্রকাশ করেছে। অনুমান করি, তাদের অর্থায়ন নিশ্চয়ই ৮০ কোটি টাকার ধারে-পাশে নয়।

আমাদের শিক্ষক গবেষকদের মেধা কাজে লাগাতে হলে তাঁদের গবেষণার পরিবেশ ও সুযোগ তৈরি করতে হবে। এর সঙ্গে এটাও নিশ্চিত করা দরকার, গবেষণার জন্য প্রদত্ত অর্থ যাতে সফল ও কার্যকরভাবে ব্যয় করা হয়, ক্রয়েই যাতে সব সাফল্য কেন্দ্রীভূত না থাকে, সব কৃতিত্ব যাতে সীমিত সম্পদের দেশের অর্থ বরাদ্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে। অর্থায়নের জন্য যোগ্য গবেষক নির্বাচন ও যথাযথ মনিটরিংয়ের মাধ্যমে এই অর্থায়নকে অর্থবহ করা সম্ভব। প্রয়োজনে অনুদানপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের তালিকা ও প্রকল্পের সফলতার তথ্যসহ একটি ডেটাবেইস নিয়মিতভাবে আপডেট করে পরবর্তী সময়ে প্রকল্প বাছাইয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই অর্থায়নে আমাদের গবেষণা সাফল্য যদি উৎসাহব্যঞ্জক না হয়, তাহলে তার ধারাবাহিকতা বজায় না-ও রাখা যেতে পারে। সীমিত সম্পদ দিয়ে আমাদের সরকারগুলো বিজ্ঞানীদের জন্য যে সুযোগ সৃষ্টি করেছে, এ জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই, ভবিষ্যতে এই বরাদ্দ যাতে বৃদ্ধি করা হয় এবং বরাদ্দের টাকা দিয়ে যোগ্যতর বিজ্ঞানী ও গবেষকদের আকৃষ্ট করে যথাযথ মনিটরিংয়ের মাধ্যমে তার সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়, গবেষণার ফলাফল যাতে আমাদের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে, সেই প্রত্যাশা করি।

> আমাদের শিক্ষক গবেষকদের মেধা কাজে লাগাতে হলে তাঁদের গবেষণার পরিবেশ ও সুযোগ তৈরি করতে হবে। এর সঙ্গে এটাও নিশ্চিত করা দরকার, গবেষণার জন্য প্রদত্ত অর্থ যাতে সফল ও কার্যকরভাবে ব্যয় করা হয়, ক্রয়েই যাতে সব সাফল্য কেন্দ্রীভূত না থাকে, সব কৃতিত্ব যাতে সীমিত সম্পদের দেশের অর্থ বরাদ্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে

● মোহাম্মদ কায়কোবাদ: অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও ফেলো, বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস।